POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (বাকারা:186)

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে। (আল বাকারা: ১৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 15

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 এপ্রিল, 2022 12 রমযান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রমযানের গুরুত্ব

১৮৯৮) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে, তখন উর্ধ্বলোকের দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।

১৯০১) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে কেউ লায়লাতুল কদরে ঈমান রেখে পুণ্যের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী ও পশ্চাতবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে কেউ ঈমানের সঙ্গে পুণ্যের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখবে, তার অগ্রবর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(সহী বুখারী, ৩য়, কিতাবুস সাউম)

জুমআর খুতবা, ১১ মার্চ, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াত থেকে রমযান মাসের মহত্ব অনুধাবন করা যায়। সুফিগণ লিখেছেন, এই মাসটি হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করার জন্য উৎকৃষ্ট মাস। এই মাসে বিপুল হারে দিব্য-দর্শন লাভ হয়। নামায মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা অন্তরকে আলোকিত করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

মগরিবের নামাযের কয়েক মিনিট পূর্বে রমযানের চাঁদ দেখা গেল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মগরিবের নামায পড়ে চাঁদ দেখতে মসজিদের ছাদে এলেন। চাঁদ দেখে তিনি মসজিদে ফিরে এসে বললেন:

গত রমযানের জন্য মনে হচ্ছে যেন কালকেই অতিবাহিত হয়েছে। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াত থেকে রমযান মাসের মহত্ব অনুধাবন করা যায়। সুফিগণ লিখেছেন, এই মাসটি হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করার জন্য উৎকৃষ্ট মাস। এই মাসে বিপুল হারে দিব্য-দর্শন লাভ হয়। নামায মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা অন্তরকে আলোকিত করে। অন্তর পরিশুদ্ধ করার অর্থ অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে দূরত্ব তৈরী করা। আর অন্তরকে আলোকিত করার অর্থ খোদাকে দেখার জন্য কাশফ (দিব্য-দর্শন)-এর দ্বার উন্মুক্ত হওয়া। অতএব, اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে কোনও সন্দেহে নেই যে, রোযার প্রতিদান মহান। কিন্তু রোগব্যধি ও বিভিন্ন কারণ মানুষকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখে। আমার মনে আছে, যৌবনে আমি একবার স্বপ্নে দেখি,রোযা রাখা আহলে বয়আতের সুন্নত। আমার পক্ষে খোদার পয়গম্বর বললেন- سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ সালমান অর্থাৎ 'আস সুলহান'। যার অর্থ এই ব্যক্তির হাতে দুটি শান্তি চুক্তি হবে। একটি অভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয়টি বাহ্যিক। সে তার কাজ ভালবাসা সহকারে করবে, তরবারির জোরে নয়। আমি হোসেনের পদ্ধতি অবলম্বন করব না, যে যুদ্ধ করেছিল, বরং আমি হাসান-এর পদ্ধতি অবলম্বন করব, যে যুদ্ধ করে নি। আমি মনে করি যে, রোযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই আমি ছয় মাস পর্যন্ত রোযা রাখি।এই সময়ের মধ্যে আমি দেখেছি, আলোকের স্তম্ভ আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু আলোকক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছে, না কি আমার হৃদয় থেকে তা স্পষ্ট নয়। এই সব কিছু যৌবনে সম্ভব ছিল আর যদি আমি সেই সময় ইচ্ছে করতাম, তাহলে চার বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে পারতাম। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

এই কিতাব সমগ্র পৃথিবীর কাছে পোঁছনো জরুরী। কেননা এটি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নাযেল হয়েছে আর এটি সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: রোযার মাসে মানুষ খোদা তা'লার সাদৃশ্য গ্রহণ করে নেয়। রোযার এটিও একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ। খোদা তা'লার একটি গুণ হল, তিনি নিদ্রা থেকে পবিত্র। মানুষ নিজের নিদ্রাকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু রোযার সময় এর কিছুটা অংশ খোদা তা'লার জন্য অবশ্যই ত্যাগ করে; সেহরি খাওয়ার জন্য ওঠে, তাহাজ্জুদ পড়ে। যে সব মহিলারা রোযা রাখে না, তারাও সেহরির ব্যবস্থা করার জন্য ঘুম থেকে ওঠে। কিছুটা সময় দোয়ায় আর কিছুটা নামাযে ব্যতীত করতে হয়। আর এভাবে রাতের খুব কম অংশ ঘুমের জন্য বাকি থাকে। আর যারা কাজ করে, গ্রীষ্মকালে তাদের জন্য মাত্র দুই তিন ঘন্টায় ঘুমের জন্য বাকি থাকে। এভাবে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে মানুষের একটি সাদৃশ্য তৈরী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা পানাহার করা থেকে পবিত্র। মানুষ পানাহার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারে না। তবু রমযানে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এ বিষয়ে সে এক প্রকারের সাদৃশ্য অবশ্যই তৈরী করে। এছাড়া যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল কল্যাণই প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে মানুষকেও রোযার সময় বিশেষ করে পুণ্য কর্ম সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনিন্দা-পরচর্চা ইত্যাদি অসৎ কর্ম পরিহার করে না, তার রোযা হয় না। অর্থাৎ মোমেনও চেষ্টা করে যে তার থেকে যেন কেবল কল্যাণই প্রকাশ পায় আর সে পরনিন্দা ও পরচর্চা এবং ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলে। এভাবে সে সেই সীমা পর্যন্ত খোদার সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরী করে নেয় যতটা সম্ভব হয়। আর একথা স্পষ্ট যে, প্রতিটি বস্তু তার অনুরূপ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অতএব, রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ এই যে যে, এক উচ্চ পর্যায়ে খোদা তা'লার সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে আর খোদা তা'লা স্বয়ং তার রক্ষক হয়ে ওঠেন।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: বাংলা ডেস্ক-এর ইনচার্জ হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর লেখেন- বাংলাদেশে জাতির নায়কদের মূর্তি তৈরীর প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। ইসলামে কোনও নায়কের মূর্তি করা বৈধ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর চিঠিতে বলেন: কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, ইসলামের পূর্বে আম্বিয়াদের যুগে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্র ও মূর্তি শিল্পের কাজ করা হত। যেমনটি হযরত সুলেমান (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জিন্নেদের একটি দল তাঁর ইচ্ছানুসারে মূর্তি তৈরী করত। (সূরা সাবা: ১৪) অনুরূপভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবদের কাছে বিভিন্ন নবীদের চিত্র ছিল, যাদের মধ্যে আঁ হুযুর (সা.)-এর চিত্র ছিল। (আত তারিখুল কাবীর, প্রণেতা আবু আব্দুল্লাহ্ ইসমাইল বিন ইব্রাহিম, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৯) এছাড়া বাচ্চাদের খেলার জন্য পুতুলও হত, যেমনটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় রেওয়াতে থেকে জানা যায় যে, শৈশবে তাঁর কাছে খেলনার মধ্যে পুতুল ছিল আর ডানাযুক্ত ঘোড়া ছিল যা আঁ হযরত (সা.)ও দেখেছেন। আর সেগুলির বিষয়ে কখনও তিনি নিজের অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেন নি। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল লাআবে বিল বিনাত)

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যেহেতু শিরক তথা পৌত্তলিকতা শিখর স্পর্শ করেছিল, সেই কারণে হুযুর (সা.) সামান্যতম শিরক ও পৌত্তলিকতার সংমিশ্রন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন প্রত্যেক কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করেছেন এবং কঠোরভাবে তাকে নিরুতসাহিত করেছেন। বাড়িতে দরজায় টাঙানো পর্দা অথবা বসার গদিতে অঙ্কিত চিত্র দেখে হুযুর (সা.) ভীষণভাবে নিজের বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করেছেন এবং সেগুলি খুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)

অনুরূপভাবে হুযুর (সা.) তৎকালীন যুগের প্রচলিত চিত্রকারিতার মাধ্যমে তৈরী করা চিত্রও নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি (সা.) চিত্রকারিতাকে অবৈধ এবং আযাবের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে তাঁর প্রভু ও মান্যবর হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) -এর পদাঙ্ক অনুসরণে হুযুর (সা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি 'ইন্না বিল আমালু বিন্নিয়াত'-এর আলোকে এই বিষয়টির সমাধান উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন- সৎ উদ্দেশ্যে করা কাজ বৈধ। কিন্তু সেই একই কাজ অসৎ উদ্দেশ্যে করলে তা অবৈধ হবে। হুযুর (আ.) তবলীগ এবং সত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজের ছবি প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন, যার প্রতিক্রিয়ায় সে যুগের তথাকথিত মৌলবী সমাজ এই সৎ উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেছে এবং খারাপভাবে সেটিকে বর্ণনা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে জগতবাসীকে উস্কানি দিয়েছে। হুযুর (সা.) তখন বিরুদ্ধবাদীদেরকে এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন- এরা যদি ছবিকে এতটাই খারাপ মনে করে, তবে সম্রাটের চিত্রাঙ্কিত টাকা এবং দুই আনা ও চার আনাগুলিকে নিজেদের পকেট ও ঘর থেকে বাইরে ফেলে দেয় না কেন? অনুরূপভাবে নিজেদের চোখগুলিকেও কেন তুলে নেয় না কেন? কেননা এগুলির উপরও সমস্ত বস্তুর চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। অপরদিকে হুযুর (আ.) সেই একই কাজকে অসৎ উদ্দেশ্যে করাকে অপছন্দ করেছেন এবং তা বিদাত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়টির দুইটি দিক স্পষ্ট করতে গিয়ে হুযুর (আ.) বলেন-' আমার ছবি তুলে সেটিকে পৌত্তলিকদের মত কাছে রেখে দেওয়া বা প্রচার কারার আমি বিরোধী। আমি কাউকে এমনটি করার মোটেই নির্দেশ দিই নি। আমার থেকে বেশি পৌত্তলিক বিরোধী বা ছবি বিরোধী কেউ নেই। কিন্তু আমি দেখেছি যে, ইউরোপের মানুষ কারো লেখা পড়তে চাইলে প্রথমে তার ছবি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা ইউরোপের মানুষের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। তাদের অধিকাংশ মানুষই কেবল ছবি দেখতে চিনতে পারে যে, দাবিদার সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী।তারা হাজার হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থান করার জন্য আমার কাছে পৌঁছতে পারে না, তাই আমাকে দেখতেও পারবে না। সেই কারণে সেদেশের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষেরা আমার ছবি দেখে আমার আধ্যাত্মিকতা পরখ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে অনেকে আমাকে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমরা আপনার ছবি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখেছি। অন্তর্দৃষ্টি বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়েছে যে এই ছবি যার সে মিথ্যাবাদী হতে পারে না। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড- ২১, ৩৬৫)

অনুরূপভাবে তিনি বলেন: 'ইন্না মাআল আমালু বিন্নিয়াত'। ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত নয়, এটিই আমার বিশ্বাস। কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত, জিন্নেদের দল হযরত সুলেমান (আ.)-এর জন্য চিত্র তৈরী করত আর বানী ইসরাঈল জাতি কাছে বহু কাল পর্যন্ত আম্বিয়াগণের চিত্র সংরক্ষিত ছিল, যার মধ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর ছবি ছিল। আর আঁ হযরত (সা.)কে একটি রেশমের কাপড়ের উপর জিবরাইল (আ.) হযরত আয়েশার ছবি দেখিয়েছিলেন। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১,পৃ: ৩৬৫)

তিনি আরও বলেন: 'পরিতাপ! এরা অন্যায়ভাবে অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপ করার সুযোগ দিচ্ছে। ইসলাম যাবতীয় বৃথা কর্ম এবং শিরকে সহায়ক কর্মসমূহকে নিষিদ্ধ করেছে। এমন কাজকে ইসলাম নিষিদ্ধ আখ্যা দেয় না, যেগুলি নৃ-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং রোগ নির্ণয়ের মাধ্যম হয় আর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষদেরকে হিদায়তের কাছাকাছি নিয়ে আসে। কিন্তু তবু মোটেই এমনটি পছন্দ করি না যে, একান্তই বাধ্য করে এমন কোনও প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমার জামাতের মানুষ আমার ফটো ব্যপকহারে প্রকাশ করাকে নিজেদের পেশায় পরিণত করুক। কেননা এভাবেই কালক্রমে বিদাতের জন্ম হয় এবং তা শিরক পর্যন্ত পোঁছে যায়। এই কারণে আমি এখানে আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তাদের জন্য যতদূর সম্ভব হয় তারা যেন এমন কাজ থেকে বিরত থাকে। কতিপয় ব্যক্তির আমি কার্ড দেখেছি, যেগুলির পশ্চাদভাগের এককোণে আমার ছবি ছিল। আমি এর প্রকাশনার প্রবল বিরোধী। আমি চাই না, আমার জামাতের কেউ এমন কাজে লিপ্ত হোক। একটি সঠিক ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কাজ করা এক কথা আর হিন্দুদের ন্যায় মহাপুরুষদের ছবি যত্রতত্র লাগিয়ে রাখা অন্য বিষয়। সব সময় দেখা গেছে যে, এমন বৃথা কর্ম থেকেই শিরকের উৎপত্তি ঘটে এবং তার থেকে বড় বড় পাপের জন্ম নেয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া,৫ম ভাগ রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৩৬৭)

সুতরাং বাংলাদেশে এই মূর্তিগুলি যদি কোন সৎ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা তৈরী করতে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু যদি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তা তৈরী করা হয়ে থাকে তবে অনুচিত এবং অবৈধ।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি হুযুর (আই.)কে প্রশ্ন লিখে পাঠান যে, হুযুর (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে হযরত আলি (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার চাচার ছেলে কোথায়?' অনুরূপভাবে হুযুর (সা.) হযরত আব্বাস এবং হযরত আবু তালিব-এর জন্যও চাচা শব্দ ব্যবহার করেছেন আর হযরত আলি (রা.) হযরত খাদিজা সম্পর্কে চাচি শব্দ্য ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটি একটু স্পষ্ট করবেন।

হুযুর (আই.) ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে বলেন: প্রত্যেক সমাজের কিছু রীতি রেওয়াজ এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ রয়েছে, যা সেই সমাজের রেখচিত্র সামনে রেখেই বোঝা সম্ভব। কিছু পরিবারে পিতার সঙ্গে কোনও ব্যক্তির যে সম্পর্ক থাকে, পারিবারিক রীতি বা প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী সেই সম্পর্কটি সন্তানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। হযরত আলি যেহেতু হুযুর (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, সেই কারণে সামাজিক রীতি অনুসারে হুযুর (সা.) তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার চাচার ছেলে কোথায়?

এছাড়া আরবে 'ইয়া ইবনে আম্মি' এবং 'ইয়া ইবনে আখি' অর্থাৎ হে আমার চাচার ছেলে এবং হে আমার ভাইপো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের বহুল প্রচলন ছিল আর তা আজও রয়েছে। বড়রা তার থেকে বয়সে ছোটদেরকে সম্বোধন করতে 'ইয়া ইবনে আখি' অর্থাৎ হে আমার ভাইপো শব্দ ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করার পরিবর্তে 'ইয়া ইবনে আম্মি' অর্থাৎ হে আমার চাচার ছেলে' শব্দবন্ধন ব্যবহার করত।

হযরত আলির হযরত খাদিজা (রা.)-এর জন্য চাচি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, আরবীতে ফুপু এবং চাচি উভয়ের জন্য 'আম্মাতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। মনে হচ্ছে যে, আপনি কোনও স্থানে আম্মাতি শব্দ পড়ে তার অনুবাদ চাচি বলে মনে করেছেন। তবে হযরত খাদিজা এবং হযরত আলি (রা.)-এর প্রসঙ্গে এই শব্দটির অর্থ হবে ফুপু। কেননা, হযরত খাদিজা এবং হযরত আবু তালিবের বংশ পঞ্চম পুরুষে কুস্সা বিন কিলাবে এসে মিলিত হয়েছে। সেই দিক থেকে সম্পর্কে হযরত খাদিজা হযরত আলির ফুফু ছিলেন।

জুমআর খুতবা

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র প্রাণী আমাকে ছিড়ে খাবে বলে আমি নিশ্চিত জানলেও উসামার সেনাদলের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আমি বাস্তবায়ন করে ছাড়ব।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

"তোমরা কি চাও, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কোহাফার পুত্র সর্বপ্রথম এ (অন্যায়) কাজটি করুক অর্থাৎ, যে সৈন্যবাহিনীকে মহানবী (সা.) যাত্রা করার আদেশ দিয়েছিলেন তাকে বিরত রাখুক?

আল্লাহর শপথ! যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা যদি আমাকে একটি রশি প্রদানেও অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আদায় করতো তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

আল্লাহ্‌র পথে বন্দী মাননীয় মাহমুদ ইকবাল হাশমি সাহেব (লাহোর)-এর মা সৈয়্যদা কায়সারা যাফর হাশমি সাহেবের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১১ মার্চ, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১১ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:খিলাফতে আসীন হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। তন্মধ্যে প্রথম সমস্যা হিসেবে যেটির কথা বলা হয়েছিল তা ছিল মহানবী (সা.)-এর বিয়োগ বেদনা, যা প্রত্যেক মুসলমানের মাঝে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুঃখ ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর, কেননা তিনি (তাঁর) বাল্যকালের সঙ্গী ছিলেন। এছাড়া তাঁর বিশ্বস্ততার যে মর্যাদা ছিল এবং বয়আতের যে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল– তা অন্য কারো ছিল না। কিন্তু তখন তিনি অনেক সাহসিকতা দেখান (এবং দৃঢ়) ঈমানের সাক্ষর রাখেন। বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম স্পর্শকাতর এবং ভয়াবহ বিষয় ছিল মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর শোক, যাতে সকল সাহাবী দুঃখের আতিশয্যে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুর এই আকস্মিক শোক কেউ সামলে উঠতে পারছিল না। মহানবী (সা.)-এর বিচ্ছেদের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। তাঁর (সা.) মৃত্যুর আকস্মিক ঘটনা এত ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ছিল যে, বড় বড় সাহাবীরা দুঃখের আতিশয্যে বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে বসেছিলেন। হযরত উমরের ন্যায় বীরের ভালোবাসার এই উন্মাদনায় আরও খারাপ অবস্থা ছিল। তিনি তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান যে, কেউ যদি বলে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। আর এটি এমন এক প্রতিক্রিয়া ছিল যে, মুসলমানরা এই কথা শুনে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়ে, মহানবী (সা.) কি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন কি না? এই প্রেমিকেরা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় তৌহীদের মৌলিক শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে এই কথা বলার দ্বারপ্রান্তে ছিল, না, মহানবী(সা.) কখনো মৃত্যুবরণ করতে পারেন না, আর না তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মসজিদে নববীতে আগমন করেন আর সেখানে একত্রিত সকল লোককে সম্বোধন করে বলেন, হে লোক সকল! ***'মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মুহাম্মাদান ফাইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাত। ওয়া মান কানা মিনকুম ইয়াবুদুল্লাহা ফাইন্নাল্লাহা হাইয়ুন লা ইয়ামুত।'*** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইবাদত করতো সে শুনে নিক যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতো তার জন্য আনন্দের সংবাদ হলো আল্লাহ তা'লা জীবিত আর কখনো মারা যাবেন না অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি অশেষ ও অতুলনীয় ভালবাসা সত্ত্বেও, তিনি তৌহীদের পাঠ প্রদান করেছেন।

অতঃপর বলেন, ***ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ খালাত মিন কাবলিহির রসূল, আফাইম্মাতা আউ কুতেলানকালাবতুম আলা আ'কাবিকুম।*** অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল ছিলেন। আর তাঁর পূর্বে যত রসূল অতিবাহিত হয়েছেন, সকলে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে তিনি কেন মৃত্যুবরণ করবেন না? তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে আর ইসলামকে পরিত্যাগ করবে? এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) পরম সাহস এবং প্রজ্ঞার সাথে তখন শোকের এই আবহে সাহাবীদের মনোবল দৃঢ় করেন আর শোকাভিভূত এসব প্রেমিকের (ক্ষতবিক্ষত) হৃদয়ে মলমের প্রলেপ দেন। আর অপর দিকে তৌহীদের দোদুল্যমান অট্টালিকাকে ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান রাখে।

এসম্পর্কে হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্য হলো: এরপর সেসব ধারণা, যা মহানবী (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে কতিপয় সাহাবীর হৃদয়ে দাঁনা বেধেছিল, একটি সাধারণ জলসায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতের বরাত টেনে তিনি সেই সমস্ত ধারণা দূর করেন আর একইসাথে এই ভ্রান্ত ধারণারও মূলোৎপাটন করেন যা হযরত মসীহ্ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর হাদীস সমূহের প্রতি পূর্ণ প্রণিধান না করার কারণে কারো কারো হৃদয়ে পাওয়া যেত।"

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৮৪)

দ্বিতীয় বড় কাজ বড় কাজ, যা তিনি সাধন করেছেন তা হলো, খিলাফতের নির্বাচনের সময় মুসলিম উম্মতকে ঐক্যের মালায় গেঁথে দেওয়া।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর সম্ভাব্য আরেকটি যে শঙ্কা দেখা দেয় তা ছিল সাকীফা বনু সায়েদায় আনসারদের একত্রিত হওয়া, যেখানে প্রাথমিক অবস্থায় এমন মনে হচ্ছিল যে, আনসাররা কোন মূল্যে মুহাজেরদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের আমীর বা খলীফা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। আর মুহাজেররা আনসারদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা বানাতে প্রস্তুত হবে না। আর মতবিরোধমূলক বক্তৃতা ছাড়িয়ে বিষয় তরবারি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। এহেন স্পর্শ কাতর পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কথায় আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রভাব সৃষ্টি করেন আর অন্যদিকে মানুষের হৃদয়কে হযরত আবু বকরের প্রতি আকৃষ্ট করেন যে, এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ পুনরায় ভালোবাসা ও ঐক্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যেমনটি হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আর যেভাবে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ইউশা বিন নূন-এর কথা কর্ণগোচর করে আর কেউ মতবিরোধ করে নি এবং সবাই নিজ আনুগত্য প্রকাশ করে, একই ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে ঘটেছে। সবাই মহানবী (সা.)-এর বিয়োগে অশ্রু ঝরিয়ে আন্তরিক অনুরাগের সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকে গ্রহণ করে।"

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৮৬)

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ফিতনা যা সামলানো একান্ত আবশ্যক ছিল তা হযরত আবু বকর কীভাবে সম্পাদন করেন? সেই বিষয়টি হলো উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করা। মহানবী (সা.) এই সেনাবাহিনীকে সিরিয়ার সীমান্তে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। মু'তা এবং তাবুকের যুদ্ধের পর তিনি (সা.) এই আশঙ্কা করেন যে, কোথাও ইসলাম এবং খ্রিষ্ট ধর্মের ক্রমবর্ধমান

মতবিরোধ এবং ইহুদি-সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে রোমানরা আরবের ওপর আক্রমণ না করে বসে!

মু'তার যুদ্ধে মুসলমানদের তিনজন আমীর হযরত যায়েদ, হযরত জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা একের পর এক শহীদ হন। মু'তা একটি শহর যা জর্ডানের পূর্ব দিকে এক উর্বর ভূমিতে অবস্থিত।

(আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা: মহম্মদ হোসেন হেয়ক্যাল, উর্দু অনুবাদ- মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ১২৩) (দায়েরাহ মারেফুল ইসলামিয়া, খণ্ড-২১, পৃ: ৭৩১)

যাহোক এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মানুষকে হযরত যায়েদ এবং হযরত জাফর আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা-র মৃত্যুর সংবাদ দেন- মানুষের কাছে এ সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসার পূর্বেই। তিনি (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন, এরপর জাফর তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নেন এবং তিনিও শাহাদত বরণ করেন। তখন তাঁর (সা.) চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। অতঃপর তিনি বলেন, অবশেষে আল্লাহ্র তরবারি সমূহের মধ্য থেকে একটি তরবারি, অর্থাৎ খালেদ বিন ওয়ালীদ পতাকা গ্রহণ করেন, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেসব বিরোধীদের ওপর জয়যুক্ত করেন।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৭)

এরপর তিনি (সা.) স্বয়ং মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস পায় নি। আর তারা সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকাতেই নিজেদের জন্য মঙ্গল নিহিত বলে মনে করে। এসব যুদ্ধের কারণে মুসলমানদের বিষয়ে রোমানদের সংকল্প অনেক ভয়াবহ হয়ে উঠে। আর তারা আরবের সীমান্তে আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে। এ কারণেই মহানবী (সা.) সতর্কতামূলকভাবে উসামাকে সিরিয়ায় রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা: মহম্মদ হোসেন হেয়ক্যাল, উর্দু অনুবাদ- মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ১২৪)

আর একটি উদ্দেশ্য মু'তার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণও ছিল। উসামা বাহিনীর প্রস্তুতি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে শনিবারে সম্পন্ন হয়। এর সূচনা তাঁর (সা.) অসুস্থতার পূর্বে-ই হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সা.) সফর মাসের শেষে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি হযরত উসামাকে ডাকেন এবং বলেন, তোমার পিতার শাহাদত স্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও আর তাদেরকে ঘোড়ায় পিষ্ট করে দাও। আমি তোমাকে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছি।

(ফাতহুল বারী লি ইবনে হিজর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, বালক্বা ও দারূম-কে ঘোড়া দিয়ে পিষ্ট করে দাও অর্থাৎ তারা এমন যারা যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সাথে ভালোভাবে যুদ্ধ কর। বালক্বা সিরিয়ার একটি অঞ্চল, যা দামেস্ক এবং কুরা- উপত্যকার মাঝে অবস্থিত। দারূম মিশর যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনে গাযা-র পর একটি স্থান।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১১৯)

যাহোক, সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সকাল হতেই উবনাবাসীদের ওপর আক্রমণ কর। উবনা-ও সিরিয়ায় বালক্বা-র পথে একটি জায়গার নাম। আর দ্রুত সফর কর যেন তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছার পূর্বে-ই তোমরা (সেখানে) পৌঁছে যাও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যদি তোমাদের সাফল্য দান করেন তাহলে সেখানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত রেখো আর তোমাদের সাথে পথ চেনে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যেও। আর গোয়েন্দা ও গুপ্তসংবাদ সংগ্রহকারীদের তোমাদের পূর্বেই রওয়ানা করে দাও। মহানবী (সা.) হযরত উসামার জন্য নিজ হাতে একটি ঝান্ডা বাঁধেন। এরপর বলেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে তাঁর পথে জিহাদ কর। আর তার সাথে যুদ্ধ কর যে আল্লাহ্ তা'লাকে অস্বীকার করেছে। হযরত উসামা মহানবী (সা.)-এর হাতে বাঁধা এই ঝাণ্ডা নিয়ে বের হন এবং সেটি হযরত বুরায়দা বিন হুসায়েব এর হাতে তুলে দেন আর জুরফ নামক স্থানে বাহিনীকে একত্রিত করেন। জুরফ-ও মদিনার উত্তরে তিন মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। যাহোক, মুহাজের ও আনসারদের সম্মানীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ এমন ছিল না যাকে এই যুদ্ধের জন্য ডাকা হয় নি। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ , হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত কাতাদা বিন নোমান (রা.), হযরত সালমা বিন আসলাম (রা.)- তারা সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিছু লোক কথা বলা আরম্ভ করে দেয় এবং বলে, এই ছেলেকে প্রাথমিক মুহাজেরদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হচ্ছে। এ কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর মাথা একটি রুমালে বেঁধে রেখেছিলেন আর তিনি একটি চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি মিম্বরে চড়েন আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর বলেন, হে লোক সকল! উসামাকে আমীর বানানো সম্পর্কে তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয়ের মন্তব্য আমার কাছে পৌঁছেছে। আমার উসামাকে আমীর বানানোর ক্ষেত্রে যদি তোমরা আপত্তি করে থাক তাহলে এর পূর্বে তার পিতাকে আমীর বানানোর বিষয়েও তোমরা আপত্তি করেছ। খোদার কসম, তিনি এমারতের যোগ্য ছিলেন, আর তারপর তার পুত্রও এমারতের যোগ্য। তিনি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর নিশ্চিতভাবে এরা উভয়ে এমন যে, তাদের সম্পর্কে সকল প্রকার পুণ্য এবং কল্যাণের আশা করা যেতে পারে।

অতএব তার অর্থাৎ উসামার ক্ষেত্রে সুধারণা রাখ, কেননা তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। এটি ছিল ১০ রবিউল আউয়াল এবং শনিবার দিন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দুই দিন পূর্বের কথা। যেসব মুসলমান হযরত উসামার সাথে রওয়ানা হচ্ছিল, তারা মহানবী (সা.)কে বিদায় জানিয়ে জুরফ নামক স্থানে বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য চলে যায়। মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তিনি এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিতে থাকেন যে, উসামার বাহিনীকে প্রেরণ কর। রবিবারে মহানবী (সা.)-এর ব্যাথা আরও বৃদ্ধি পায়। হযরত উসামা বাহিনীর কাছ থেকে ফিরে আসেন। তখন মহানবী (সা.) অচেতন অবস্থায় ছিলেন। সেদিন মানুষ তাঁকে ঔষধ খাইয়েছিল। হযরত উসামা ঝুঁকে মহানবী (সা.)-কে চুমু খান। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি (সা.) নিজের উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে হযরত উসামার মাথায় রাখেন। হযরত উসামা বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, তিনি (সা.) আমার জন্য দোয়া করছেন। হযরত উসামা বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন। হযরত উসামা সোমবার দিন পুনরায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তখন তিনি (সা.) সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উসামাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বরকতের সাথে রওয়ানা হয়ে যাও।

হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ সৈন্যবাহিনী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং লোকদেরকে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি যাত্রা করার মনস্থ করতেই তার মা উম্মে আয়মানের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এই বার্তা নিয়ে আসে যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তখন হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা (রা.)ও তার সাথে ছিলেন এবং তখন মহানবী (সা.) মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার সূর্যাস্তের পর তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন যেকারণে মুসলিম সৈন্যবাহিনী জুরফ নামক স্থান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে এবং হযরত বুরায়দা বিন হুসায়েব (রা.) হযরত উসামা (রা.)-এর পতাকা নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দ্বারে গেঁড়ে দেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামা (রা.)-এর সৈন্যবাহিনী যি-খুশুব নামক স্থানে থাকা অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর প্রয়াণ হয়। যি-খুশুব মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে একটি উপত্যকার নাম। মোটকথা যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত করা হয়ে যায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বুরায়দা বিন হুসায়েব (রা.)-কে আদেশ দেন, পতাকা নিয়ে উসামার ঘরে যাও যেন তিনি নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাত্রা করতে পারেন। হযরত বুরায়দা (রা.) পতাকা নিয়ে সেনাদলের প্রথম স্থানে নিয়ে আসেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৬-১৪৭) (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াত, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩০২) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড , পৃ: ১০১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১১৪)

কথিত আছে উক্ত সেনাদলের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

(শারাহ যারকানি আল মোয়াহিবুদ লাদানিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

এবং অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সাতশত ব্যক্তির নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রা.) ঘোষণা করিয়ে দেন, উসামার অভিযান পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তাই উসামার সেনাদলের মাঝ থেকে

কোনও এক ব্যক্তিও যেন মদীনায় থেকে না যায়, সবাই যেন জুরফ-এ গিয়ে উক্ত সেনাদলের সাথে যোগদান করে।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর সমস্ত আরবে, বিশেষ হোক বা সাধারণ, প্রায় সকল গোত্রে ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে কপটতা প্রকাশ পায় আর সেসময় ইহুদী-খ্রিষ্টানরা মাথা চাড়া দিতে থাকে এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু আর মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের (তথা মুসলমানদের) অবস্থা বৃষ্টি ভেজা রাতের ভেড়া-ছাগলের ন্যায় ছিল [তথা একেবারেই সহায়সম্বলহীন ছিল]। তখন লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলল, এরা কেবল উসামার সৈন্যবাহিনীকেই মুসলমানদের সৈন্য-সামন্ত ভাবছে আর আপনি যেরূপ দেখছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলকে আপনার থেকে পৃথক করা সমীচীন হবে না (তথা উসামার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা সমীচীন হবে না)। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র প্রাণী আমাকে ছিড়ে খাবে বলে আমি নিশ্চিত জানলেও উসামার সেনাদলের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আমি বাস্তবায়ন করে ছাড়ব।

অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই! যদি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের পা কুকুর টানাহেঁচড়াও করে, তবুও মহানবী (সা.) যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, আমি সেই সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে আনবো না আর না-ই আমি সেই পতাকা খুলব- যেটি স্বয়ং মহানবী (সা.) বেঁধেছিলেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু, ৩য় খণ্ড, (তারিখু তাবারী,২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: "মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন পুরো আরব মুর্তাদ হয়ে যায় এবং হযরত উমর (রা.) আর হযরত আলী (রা.)-এর ন্যায় বীরপুরুষও এই নৈরাজ্য দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) নিজ মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে একটি সৈন্যবাহিনী রোমান অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং হযরত উসামা (রা.)-কে এর (তথা উক্ত সেনাদলের) সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। উক্ত সৈন্যবাহিনীর যাত্রার পূর্বেই মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর (সা.) মৃত্যুতে যখন আরববাসী মুর্তাদ হয়ে যায় তখন সাহাবীরা চিন্তা করলেন, এমন বিদ্রোহের সময় যদি উসামার সৈন্যবাহিনী রোমান অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হয় তাহলে পশ্চাতে কেবল বৃদ্ধ পুরুষ এবং শিশু বালকেরা আর মহিলারা রয়ে যাবে এবং মদীনা সুরক্ষিত রাখার কোনো উপায় উপকরণ থাকবে না। তাই তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠ সাহাবাদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে যাক এবং তাঁর কাছে নিবেদন করুক, তিনি যেন বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত উক্ত সৈন্যবাহিনীর যাত্রা স্থগিত রাখেন। অতএব হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবী তাঁর (রা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং তারা উক্ত দরখাস্ত উপস্থাপন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধের স্বরে সেই প্রতিনিধি দলকে জবাবে বললেন: "তোমরা কি চাও, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কোহাফার পুত্র সর্বপ্রথম এ (অন্যায়) কাজটি করুক অর্থাৎ, যে সৈন্যবাহিনীকে মহানবী (সা.) যাত্রা করার আদেশ দিয়েছিলেন তাকে বিরত রাখুক?

এছাড়া তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি শত্রু সৈন্যবাহিনী মদীনাতে প্রবেশ করে এবং কুকুর মুসলিম মহিলাদের লাশ নিয়ে টানাহেঁচড়াও করে, তবুও আমি সেই সৈন্যবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করব না যার যাত্রার করার সিদ্ধান্ত স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন। এই সাহস এবং বীরত্ব হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝে সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, খোদা তা'লা বলেছেন: "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মা'আহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফার" (তথা আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রম)। যেভাবে বিদ্যুতের সাথে সাধারন তার সংযুক্ত হলেও তাতে অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি হয়, ঠিক সেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁর (সা.) মান্যকারীরাও "আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফার" (তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রম)-এর সত্যায়নস্থল হয়ে গিয়েছিলেন।"

(সেইরে রুহানী (৬), আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৯৩-৫৯৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) উসামা -বাহিনী প্রেরণের বিষয়ে নিজ রচনা 'সিররুল খোলাফা' তে এভাবে বর্ণনা করেন যে, "ইবনে আসীর ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মক্কা এবং সেখানকার গভর্ণর আতাব বিন উসায়েদের কাছে পৌঁছে তখন আতাব গা ঢাকা দেয় আর মক্কা প্রকম্পিত হয় এবং মক্কার অধিবাসী মুরতাদ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। তিনি আরো লিখেন, আরববাসী মুরতাদ হয়ে যায়, প্রত্যেক গোত্রের মাঝ থেকে সাধারণ-অসাধারণ সকলের পক্ষ থেকে কপটতা প্রকাশ পায় আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দিতে থাকে। এছাড়া মুসলমানদের আপন নবী (সা.)-এর মৃত্যু আর নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে অবস্থা এমন হয়েছিল যেভাবে বৃষ্টি ভেজা রাতে ছাগল ভেড়ার হয়ে থাকে। তখন লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, এরা কেবল উসামার সৈন্যবাহিনীকেই মুসলমানদের সৈন্য-সামন্ত ভাবছে আর আপনি যেরূপ দেখছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলকে আপনার থেকে পৃথক করা সমীচীন হবে না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) (দীপ্তকণ্ঠে) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র প্রাণী যদি আমাকে ছিঁড়ে খাবে বলে আমি নিশ্চিতও জানি তবুও অব্যশ্যই আমি মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী উসামার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করব। মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন আমি তা রহিত করতে পারি না।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ১৮৮-১৮৯-এর টিকা)

মোটকথা মহানবী (সা.)-এর আদেশ তিনি (রা.) হুবহু সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন আর যেসকল সাহাবী হযরত উসমা (রা.)-এর সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদেরকে পুনরায় সেনাদলে যোগ দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে পূর্বে উসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাকে মহানবী (সা.) উক্ত সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন সে যেন কোনভাবেই পিছিয়ে না থাকে আর আমিও কোনমূল্যে পিছিয়ে থাকার অনুমতি দিব না। তাকে যদি পায়ে হেঁটেও (যুদ্ধে) যেতে হয় তবুও তাকে অবশ্যই সেনাদলের সাথে যেতে হবে। তদনুযায়ী একজনও সৈন্যবাহিনী থেকে পিছিয়ে থাকে নি।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

মোটকথা সৈন্যবাহিনী পুনরায় প্রস্তুত হয়ে যায়। কতক সাহাবা পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতার নিরীখে পুনরায় পরামর্শ দেন যে, এই মুহূর্তে এই সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রাখা হোক। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামা (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আপনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে গিয়ে তাঁকে বলুন, তিনি যেন সেনাদলের যাত্রা করার আদেশ স্থ গিত করেন যেন আমরা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি এবং মুশরিকদের আক্রমণ থেকে রসূলের খলীফা ও স্ত্রীদের এবং মু সলমানদেরকে রক্ষা করতে পারি। হযরত উসামার সৈন্যদলের কিছু সংখ্যক আনসার হযরত উমর (রা.)কে এই কথাও বলেছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) যদি সৈন্যবাহিনী প্রেরণে অনড় থাকেন তবে তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দিন এবং এই নিবেদন করুন যে, তিনি যেন এমন কাউকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন যিনি বয়সে হযরত উসামার চেয়ে বড় হবেন। হযরত উমর (রা.) হযরত উসমার কথায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁকে সে সব কথা বলেন যা হযরত উসামা বলেছিলেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যদি কুকুর আর নেকড়ে আমাকে ছিড়ে খায় তবুও আমি সেভাবেই এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করব যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং আমি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না যে সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদান করেছিলেন। যদি এই জনপদগুলোর মধ্যে আমি ব্যতীত অন্য একব্যক্তিও অবশিষ্ট না থাকে তবুও আমি এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করে ছাড়ব। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আনসার এমন কাউকে আমীর হিসেবে দেখতে চায় যে বয়সে হযরত উসামা থেকে বড় হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বসে ছিলেন আর এ কথা শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং হযরত উমর (রা.)-এর দাড়ি ধরে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মন্দ হোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন আর তুমি আমাকে বলছ যে, আমি যেন তাকে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করি।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৯-২০০)

(এ কথা শুনার পর) হযরত উমর (রা.) লোকজনের কাছে ফেরত আসেন। অতঃপর লোকজন বলে, কী নিষ্পত্তি হল? তখন হযরত উমর (রা.) তাদেরকে বলেন, যাও! তোমাদের মন্দ হোক, অর্থাৎ তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আজ তোমাদের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফার নিকট থেকে ভালো কিছু পাই নি।

(তারিখুত তাবারী লি ইবনে জাফার মহম্মদ বিন জারীর তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬) (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৩) অর্থাৎ তিনি আমার কথাগুলো খুবই অপছন্দ করেছেন।

যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে উসামার সৈন্যবাহিনী জুর্‌ফ নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনি (রা.) সেখানে গিয়ে সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদেরকে সুবিন্যস্ত করেন।

যাত্রার দৃশ্যও অত্যন্ত অভাবনীয় ছিল। সে সময় হযরত উসামা (রা.) বাহনে আরোহিত ছিলেন যখন কিনা হযরত আবু বকর (রা.) হাঁটছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) হযরত উসামা (রা.) এই নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! হয় আপনি অরোহণ করুন নতুবা আমি নিচে নেমে আসি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি নিচে নামবে না আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আর আমার কী হয়েছে যে আমি কিছু সময়ের জন্য স্বীয় পদযুগল আল্লাহ্'র রাস্তায় ধূলিমলিন করব না। কেননা যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কেউ যখন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন এর বিনিময়ে তার জন্য ৭ শত পুণ্য লিখা হয় এবং তার পদমর্যাদা ৭ শত গুণ উন্নীত করা হয় এবং তার ৭ শত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০)

অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, আপনি যদি যথার্থ মনে করেন তবে হযরত উমর (রা.)কে আমার কাজে সহযোগিতার জন্য রেখে যান। তখন হযরত উসামা (রা.) অনুমতি প্রদান করেন। এরপর থেকে হযরত উমর (রা.) যখনই হযরত উসামা (রা.) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, এমনকি খলীফা নির্বাচিত হবার পরও, তখন তাকে সম্বোধন করে বলতেন,'আস্ সালামু আলায়কা আইয়্যুহাল আমীর।' হযরত উমর (রা.) যেহেতু সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এজন্য সে সময় (হযরত উসামা) তাঁর আমীর ছিলেন। তাই তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আমীর! আস্‌সালামু আলাইকুম। আর হযরত উসামা (রা.) জবাব দিতেন, 'গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন।' অর্থাৎ হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা আপনার সঙ্গে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪)

যাহোক এরপর উল্লেখ আছে, পরিশেষে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানকালে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি। তোমরা অসৎপন্থা অবলম্বন করবে না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে চুরি করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, মুসলা বা অঙ্গচ্ছেদ করবে না, অর্থ াৎ কারো নাক-কান কাটবে না, চোখ উপড়ে ফেলবে না, চেহারা বিকৃত করবে না, কোন ছোট শিশুকে হত্যা করবে না আর কোন বৃদ্ধকে ও কোন নারীকেও না। কোন খেজুরের বৃক্ষ কর্তন করবে না এবং জ্বালাবেও না। কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না আর খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোন গরু-ছাগল-উট জবাই করবে না। তোমরা এমন কিছু লোকের পাশ দিয়েও যাবে যারা নিজেদেরকে গীর্জার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে রেখেছে। অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দিও, অর্থাৎ যেসব সন্ন্যাসী খ্রিষ্টান পাদ্রী রয়েছে তাদেরকে কিছু বলবে না। এছাড়া তোমরা এমন লোকদের কাছেও যাবে যারা তোমাদেরকে নানাধরণের খাদ্য বিভিন্ন পাত্রে পরিবেশন করবে তখন তোমরা তাতে আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে নিও। এমন যেন না হয়, অন্যরা খাদ্য পরিবেশন করলে হারাম মনে করে তা খাবে না বরং বিসমিল্লাহ্ পড়ে খেয়ে নিও। তোমরা এমন লোকও পাবে যারা তাদের মাথার চুল মাঝখান থেকে কামিয়ে ফেলবে এবং চতুর্দিকে লম্বা ছেড়ে রাখবে, তাদের সাথে বোঝাপড়া করবে তরবারি দিয়ে। এমন লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।বর্ণিত হয়েছে, খ্রিষ্টানদের একটি গোষ্ঠি এমন ছিল যারা রাহেব বা সন্ন্যাসী ছিল না কিন্তু ধর্মীয় নেতা ছিল। (লোকদেরকে) তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উসকে দিত এবং তারা নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তাই তিনি (রা.) বলেন, গীর্জায় যেসব রাহেব রয়েছে তাদেরকে কিছু বলবে না, কিন্তু এমন লোক এবং এদের অনুসারীদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবে। কেননা এরা নিজেরাও যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যে (মানুষকে) উসকেও দেয়। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সকল প্রকার আঘাত, সব ধরণের অসুখবিসুখ এবং প্লেগ থেকে নিরাপদ রাখুন।

(তারিখুত তাবারী, লি ইবনে জাফর মহম্মদ বিন জারীর তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)কে বলেন, মহানবী (সা.) তোমাকে যা যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তুমি সেই সব কিছুই করবে। মহানবী (সা.)-এর আদেশনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না।

(তারিখুত তাবারী, লি ইবনে জাফর মহম্মদ বিন জারীর তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)কে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

(সীরাত সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, অনুবাদ সংকলক- উমর আবু নাসার, পৃ: ৫৬১)

হযরত আবু বরক (রা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর সেনাবাহিনীকে ১১ হিজরী সনের শেষভাগে প্রেরণ করেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০২)

অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাদেরকে তিনি (রা.) ১১ হিজরী সনের ১লা রবিউস সানী তারিখে প্রেরণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

হযরত উসামা (রা.) ২০ রাতের পথ অতিক্রম করে উবনাবাসীদের বসতিস্থলে পৌঁছান এবং তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেন। (এ যুদ্ধে) মুসলমানদের সংকেত ছিল 'ইয়া মানসূর আমিত', অর্থাৎ- হে মানসুর হত্যা কর। অর্থাৎ যে-ই যুদ্ধে এসেছে তাকে হত্যা কর। যে-ই তাদের সামনে এসেছে তাকে হত্যা করেছেন এবং যাকে বাগে আনতে পেরেছেন তাকে বন্দী করেছেন। হযরত উসামা (রা.) তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অশ্বারোহীদের প্রদক্ষিণ করিয়েছেন, সেদিন তারা যেসমস্ত মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হন সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত দিন কাটান। হযরত উসামা (রা.) তাঁর পিতার সাবাহা নামের ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর তিনি (রা.) আক্রমণ করে তাঁর পিতার হত্যাকারীকেও হত্যা করেন। সন্ধ্যা হলে হযরত উসামা (রা.) লোকদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং নিজেদের চলার গতি বাড়িয়ে আর ৯ রাতে তিনি (রা.) কুরা' উপত্যকায় পৌঁছে যান। এরপর তিনি (রা.) তাঁর সুসংবাদদাতাদের মদীনা উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যেন সে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছে দেয়। এরপর তিনি (রা.) যাত্রা করার মনস্থির করেন এবং ৬ রাতে মদীনায় পৌঁছান। এ যুদ্ধে মুসলমানদের কোনো লোক শহীদ হয় নি। এই সফল ও বিজয়ী সেনাবাহিনী যখন মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীর নিরাপদ (থাকার সংবাদে) আনন্দিত হয়ে মুহাজের এবং মদীনাবাসীকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাহিরে বেরিয়ে আসেন। হযরত উসামা (রা.) তাঁর পিতার ঘোড়ায় আরোহণ করে মদীনায় প্রবেশ করেন আর হযরত বুরায়দা বিন হুসায়েব (রা.) তার সামনে পতাকা বহন করছিলেন। এভাবে তিনি (রা.) মসজিদে নববীতে পৌঁছান এবং মসজিদে প্রবেশ করে তিনি (রা.) দুই রাকাত (নফল নামায) পড়েন তারপর তিনি (রা.) নিজ গৃহে চলে যান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে এই সেনাবাহিনী ৪০ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত বাহিরে অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে এসেছিল।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০)

বর্ণিত আছে যে, এটি সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভালোবাসার দরুন হয়ে থাকবে যে, হযরত উসামা (রা.)-এর যে পতাকার গিঁট মহানবী (সা.) স্বহস্তে দিয়েছিলেন (সেটির ক্ষেত্রে) হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এটি কীভাবে সম্ভব যে, ইবনে কোহাফা সেই পতাকার গিঁট খুলবে যা মহানবী (সা.) স্বহস্তে দিয়েছেন। অতএব উসামা (রা.)-এর সেনাবাহিনীর ফিরে আসার পর সেই পতাকার বাঁধন খোলা হয় নি আর সেই পতাকা পরবর্তীতেও হযরত উসামা (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই ছিল।

(মুসীরাতুল ইসলামিয়াল জিয়ালুল খিলাফাতির রাশিদাহ, প্রণেতা- মুনীর মহম্মদ আল গাযবান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪-৩৫)

হযরত উসামা-বাহিনীর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে লিখিত রয়েছে যে, এই সেনাদল প্রেরণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত সেই সমস্ত লোক যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, পরিস্থিতির দাবি হল উসামা (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ না করা। তারা বুঝতে পেরেছে যে, খলীফার সিদ্ধান্ত কতটা সময়োপযোগী ও কল্যাণকর ছিল! এছাড়া তারা আরো জেনে যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত গভীর দৃষ্টির অধিকারী বিচক্ষণ এবং অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয়ত এই সেনাবাহিনী যাত্রা করার পূর্বে আরবের গোত্রগুলোর ওপর মুসলমানদের গভীর প্রভাব পড়ে। ফলে তারা ভাবতে আরম্ভ করে, মুসলমানদের কাছে যদি শক্তি না থাকত তাহলে তারা সেনাদল প্রেরণ করত না, অর্থাৎ তারা একারণে যথেষ্ট ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বিষয়টি হল, এমন বিদেশী শক্তি যারা আরব সীমান্তের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি রাখে বিশেষ করে রোমানদের ওপর মুসলমাদের ত্রাসের সঞ্চার হয়। রোমানরা বলতে আরম্ভ করে, এরা কেমন মানুষ! একদিকে তাদের নবী মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু এরপরও তারা আমাদের দেশের ওপর আক্রমণ করছে!

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-সালাবী, পৃ: ২৫৮,২৬৮)

যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও প্রাচ্যবিদ স্যার থমাস ওয়াকার আর্নল্ড হযরত উসামা (রা.)-এর সেনাদল সম্পর্কে (যা) লিখেছেন-

[AFTER the death of Muhammad, the army he had intended for Syria was despatched thither by Abu Bakr, in spite of the protestations made by certain Muslims in view of the then disturbed state of Arabia. He silenced their expostulations with the words: "I will not revoke any order given by the Prophet. Medina may become the prey of wild beasts, but the army must carry out the wishes of Muhammad." This was the first of that wonderful series of campaigns in which the Arabs overran Syria, Persia and Northern Africa—overturning the ancient kingdom of Persia and despoiling the Roman Empire of some of its fairest provinces.]

(The Preaching of Islam By T.W. Arnold. Chapter III. Page 41. London Constable and Company Ltd. 1913)

এর অনুবাদ হচ্ছে, মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-এর সেনাদলকে (অভিযানে) প্রেরণ করেন, যাকে মহানবী (সা.) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণের সংকল্প করেছিলেন। যদিও আরবে অস্থিরতার নিরিখেকতক মুসলমান এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের এ দ্বিধাদ্বন্দ্বকে নিজের এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জারিকৃত কোনো আদেশই আমি রহিত করব না। মদীনা বন্য হিংস্র জন্তুর শিকারে পরিণত হলেও এই সেনাবাহিনী মহানবী (সা.)-এর আকাঙ্খা অবশ্যই পূর্ণ করবে। এটি সেই সমস্ত অসাধারণ অভিযানগুলোর প্রথম অভিযান ছিল যার মাধ্যমে আরব সিরিয়া, ইরান এবং উত্তর আফ্রিকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আর প্রাচীন পারস্য সম্রাজ্যের অবসান ঘটান এবং রোমান সাম্রাজ্যের থাবা থেকে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোকে স্বাধীন করিয়ে নেয়।

অনুরূপভাবে আরেক স্থানে, অর্থাৎ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম গ্রন্থে হযরত উসামা শিরোনামের অধীনে এভাবে লিখা রয়েছে যে,

The newly-elected caliph Abu Bakr ordered the expedition to be resumed, in accordance with the Prophet's wishes, though the tribes were already in revolt. Usama reached the region of al-Balka in Syria, where Zayd had fallen, and raided the village of Ubna.....His victory brought joy to Medina, depressed by news of the ridda, thus acquiring an importance out of proportion to its real significance, which caused it later to be regarded as the beginning

of a campaign for the conquest of Syria.

(The Encyclopaedia of Islam vol. 10 Page 913 Under Usama Printed by Leiden brill 2000)

অনুবাদ: নব নিবার্চিত খলীফা আবু বকর নির্দেশ দিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে উসামার সেনাবাহিনী যথারীতি যাবে। যদিও গোত্রগুলোতে পূর্ব থেকেই বিদ্রোহ বিরাজমান ছিল উসামা সিরিয়া রাষ্ট্রের বালকা অঞ্চলে পৌঁছেন, যেখানে যায়েদকে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর উসামা উবনার জনবসতির ওপর আক্রমণ করেন। তার বিজয়ে সেই মদীনাবাসীর মাঝে আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলে যারা ধর্মত্যাগের সংবাদে ভীষণভাবে চিন্তিত ছিল। অতএব এই যুদ্ধাভিযানটি একটি সাধারণ যুদ্ধাভিযানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পরিগ্রহ করে, যার ফলে এই যুদ্ধাভিযানকে সিরিয়া বিজয়ের প্রথম ধাপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.)কে যে আরো একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হয় সেটি হল- যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের ফিতনা। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তিরোধানের সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ার পর সর্বত্র ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের অগ্নী প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সময় সমগ্র আরব ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, শুধু দুই মসজিদ, অর্থাৎ মক্কা ও মদীনার লোকেরা ব্যতীত।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মক্কাবাসী ধর্মত্যাগ করা থেকে রক্ষা পায়। এর বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, সোহেল বিন আমর (রা.) যিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তিনি তার ঠোঁটে চিহ্ন বানিয়ে রেখেছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! তার সামনের দিকের দাঁত দুটি উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দিন যেখান থেকে সে চিহ্ন বানিয়ে রেখেছে; ফলে সে আর কখনোই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়াতে পারবে না। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। অচিরেই সে এমন মর্যাদায় উপনীত হবে যখন তুমি তার প্রশংসা করবে।

হযরত উমর (রা.) তাকে শাস্তির আওতায় আনতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না! তাকে কিছু বলবে না। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যখন সে এমন মর্যাদায় উপনীত হবে এবং এমন সব কথা বলবে যার জন্য তুমি তার প্রসংশা করবে। যাহোক তিনি বলেন, সেই সময়টি তখন আসে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর মক্কাবাসী দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায়। কুরাইশরা যখন মক্কাবাসীদের মুরতাদ হতে দেখে এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মক্কাবাসীর আমীর হযরত আতাব বিন উসায়েদ উমাবী (রা.) যখন আত্মগোপন করেন তখন হযরত সোহেল বিন আমর (রা.) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, হে কুরাইশের দল! সবশেষে ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম মুরতাদ হয়ে যেও না। খোদার কসম! চন্দ্রসূর্য যেভাবে উষা থেকে গোধুলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অনুরূপভাবে এই ধর্মও বিস্তার লাভ করবে। এভাবে তিনি, অর্থাৎ হযরত সোহেল বিন আমর (রা.) এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা মক্কবাসীর হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে আর (তারা) বিরত হয়। হযরত আতাব বিন উসায়েদ (রা.) যিনি আত্মগোপন করেছিলেন তাকে ডেকে আনা হয় এবং কুরাইশরা ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮৫)

যেসব লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের বিভিন্ন ধরণ ছিল। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একজন জীবনীকার লিখেন, ধর্মত্যাগেরও বিভিন্ন ধরণ ছিল। কতিপয় লোক তো সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে প্রতিমা ও মুর্তিপূজা অবলম্বন করে। কেউ কেউ নবী হওয়ার দাবি করে, কিছু লোক ইসলামে বিশ্বাসী থাকে এবং নামাযও পড়তে থাকে কিন্তু যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। কিছু মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুতে আনন্দিত হয় এবং অজ্ঞতার যুগের কার্যকলাপ ও অভ্যাসে ফিরে যায়। কিছু লোক অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়ে এটি দেখার অপেক্ষা করতে থাকে যে, কে বিজয়ী হয়। এ সকল পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছেন জীবনীকার ও ফিকাহ্বিদগণ। ইমাম খাতাবী বলেন, মুরতাদ দুই ধরণের ছিল। প্রথমত যারা ধর্ম থেকে মুতরতাদ হয়েছে, ধর্ম ত্যাগ করে কুফরী তে ফিরে গেছে। এই ফির্কার আবার দুটি দল ছিল। একটি দল ছিল তাদের যারা মুসায়লেমা কায্যাব ও আসওয়াত আনসীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের নবুয়্যতের সত্যায়ন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) নবুয়্যতের অস্বীকার করে। দ্বিতীয় দলটি ছিল তাদের যারা ইসলাম ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়। শরীয়তের বিধিনিষেধ অস্বীকার করে এবং নামায, যাকাত ইত্যাদির মত বিষয়কে পরিত্যাগ করে অজ্ঞতার যুগের ধর্মীয় বিশ্বাসে ফিরে যায়।

অপরদিকে দ্বিতীয় ধরণের মুরতাদ হল তারা যারা নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে। (তারা) নামাযকে স্বীকার করলেও যাকাতের আবশ্যকা এবং তা খলীফাকে প্রদান করাকে অস্বীকৃতি জানায়। যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মাঝে এমন লোকও ছিল যারা যাকাত দিতে চাইত কিন্তু তাদের নেতারাতাদেরকে এথেকে বিরত রাখত। মুরতাদদের এই যে প্রকারভেদ এর মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী যেসব বিভক্তি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি হল কাজী আইয়াজের বিভক্তি। কিন্তু তিনি (এর) তিনটি ধরণ বর্ণনা করেছেন। প্র থমত যারা মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছিল। দ্বিতীয়ত যারা মুসায়লেমা কায্যাব ও আসওয়াদ আনসীর অনুসরণ করে, তারা দুজনেই নবুয়্যতের দাবিদার ছিল। তৃতীয়ত যারা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর তারা এই ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় যে, এটি মহানবী (সা.)-এর যুগ পর্যন্তই আবশ্যক ছিল।

আবার ড. আব্দুর রহমান বলেন, মুরতাদ চার প্রকারের। প্র থমত যারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত যারা মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদার আসওয়াদ আনসী, মু সায়লেমা কায্যাব ও সাজাহ্র অনুসরণ করেছে। তৃতীয়ত যারা যাকাত যে ফরয বা আবশ্যক তা অস্বীকার করেছে। চতুর্থত যারা যাকাতের ফরয হওয়া অস্বীকার না করলেও হযরত আবু বকর (রা.)কে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

(সৈয়্যদনা আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়াত ও কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ২৭২-২৭৩)

যেসব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মদীনার নিকটবর্তী গোত্র আবস, যুবইয়ান এবং তাদের সাথে লাগোয়া গোত্রসমূহ, যেমন বনু কেনানা, গাতফান ও ফুযারা।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ, পৃ: ১০১)

হওয়াযেন গোত্রও দ্বিধাদ্বন্দে ছিল তারাও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিষয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে হযরত আবু বকর (রা.) পরামর্শ চেয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.)

জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একত্র করে তাদের কাছে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ করেন। যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন যারা মুসলমান বলে দাবি করতো কিন্তু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী ছিল। হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং অধিকাংশ মুসলমানের মত ছিল, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনভাবেই যুদ্ধ করা উচিত নয়। বরং আমাদের উচিত, তাদেরকে সাথে নিয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কতিপয় লোক এই মতের বিরুদ্ধেও ছিল কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ, পৃ: ১৩৫)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সাহাবা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পরামর্শন দেন যে, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দিন আর তাদের হৃদয়ের গভীরে ঈমান ভালোভাবে গ্রথিত হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করুন এরপর তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি বরং অগ্রাহ্য করেছেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু,৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

হযরত আবু বকর (রা.) যে মতের পক্ষে ছিলেন তা হলো, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জোরপূর্বক যাকাত প্রদানে বাধ্য করা উচিত। এ বিষয়ে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, আলোচনার সময় তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলেন-

আল্লাহর শপথ! যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা যদি আমাকে একটি রশি প্রদানেও অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আদায় করতো তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ, পৃ: ১৩৫,১৩৬)

বুখারী শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, হযরত উমর বলেন, আপনি মানুষের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করবেন যখন কিনা মহানবী (সা.) বলেছেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ

[উমেরতু আন উকাতেলান্নাসা হাত্তা ইয়াকূলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মান ক্বালাহা ফাকাদ আসামা মিন্নী মালাহু ওয়া নাফসাহু ইল্লা বেহাক্কেহি ওয়া হিসাবুহু আলাল্লাহ]।

অনুবাদ: আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আমি যেন মানুষের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্ল াহ স্বীকার করে নেয় আর যে এটি মেনে নিবে সে তার ধন ও প্রাণ আমার হাত থেকে সুরক্ষিত রাখবে, তবে কোন অধিকারের বিষয় থাকলে বিষয়টি ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে তার হিসাব নেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করবো যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে কেননা যাকাত হলো সম্পদে (খোদার) অধিকার। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি আমাকে ছাগছানা প্রদান না করে যা তারা মহানবী (সা.)-কে প্রদান করতো তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, যদি তারা তা প্রদানে বিরত থাকে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি আর হলো না। আল্লাহ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্ষ উন্মোচন করেন আর আমি বুঝে যাই যে, এটিই সঠিক পন্থা অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) পরবর্তীতে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, হযরত আবু বকর (রা.) সঠিক কথা বলছিলেন।

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ সাহেব عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইল্লা বেহাক্কেহি আলইসলাম বাক্য উক্ত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে। একজন মুসলমান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর স্বীকারোক্তি করে যদি ইসলামী দায়িত্ব পালনের বিষয়ে যত্নবান না হয় তাহলে সে-ও শাস্তি যোগ্য হবে শুধুমাত্র ঈমান আনয়ন করেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না। বেহাক্কেহিল ইসলাম-এর দু'ধরনের অর্থ করা যেতে পারে। প্রথমত: ইসলামী মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত হতে পারে সেক্ষেত্রে 'হক' শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যা বহুবচনের অর্থও প্রদান করে। দ্বিতীয়ত: ইসলাম এসব সম্পদ ও প্রাণ গ্রহণ করাকে আবশ্যক আখ্যা দেয় হাক্কাল আমর অর্থাৎ আসবাতাহু ওয়া আওজাবা অর্থাৎ এটিকে আবশ্যকীয় আখ্যা দিয়েছে। এটি সকর্মক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান,১ম খণ্ড, পৃ: ৬৫)

"উম্মতের সদস্যদের নিরাপত্তার ভিত্তি অধিকার আদায়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন, কর অনাদায় বিদ্রোহ বলে পরিগণিত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ তেমনিভাবে যাকাত আদায় না করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হযরত উমর (রা.) প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে একমত ছিলেন না কিন্তু যখন ইল্লা বেহাক্কেহি' শব্দমালাসংক্রান্ত তাঁর যুক্তি শুনলেন তখন তিনি উক্ত অভিমতকে মেনে নেন। উক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুধু মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দেওয়া আমলে সালেহ বা সৎকর্ম না হওয়ার কারণে মোটেও কোন গুরুত্ব রাখে না। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হলো আয়াত فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ (সূরা তওবা, আয়াত: ৫) তথা যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে আর যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

এই সূরায় উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ তা'লা বলেন, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ (সূরা তওবা, আয়াত: ১১) অর্থাৎ যদি তওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে আর যাকাত প্রদান করে তাহলে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নয়। এই শব্দমালা থেকে প্রমাণিত হয়, এই তিনটি বিষয়ের কোন একটির পরিত্যাগকারী মুসলমান নয়। ইসলামের পাঁচটি রুকনই মেনে চলা আবশ্যক। স্বয়ং মহানবী (সা.)-ও ইল্লা বেহাক্কেহি বলে আল্লাহর রাস্তায় মালি কুরবানীকে সমাজের দুর্বল শ্রেণির অধিকার আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ সামর্থ্যবানদের জন্য ইসলামী নির্দেশাবলী মেনে চলা আবশ্যক আর তাদের ওপর ন্যাস্ত আর্থিক কুরবানীর অধিকার আদায় করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে তাদের অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে। ইল্লা বেহাক্কেহি শব্দমালা দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুক্তি সুগভীর ও তার দূরদৃষ্টি অধিকারী হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতে যাকাত আদায় না করা বিদ্রোহ আর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা ইসলামী সমাজের সদস্য থাকে না। আর তার এই বিদ্রোহের কারণে তার সাথে যুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। নিঃসন্দেহে লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ ধর্মে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নেই- নির্দেশনায় ধর্মে র বিষয়ে ইসলাম স্বাধীনতা প্রদান করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাহ্যত মুসলিম হওয়ার দাবি করে এবং ইসলামী সমাজে থেকে ইসলামের আশ্রয়ে বসবাস করে এবং ইসলামের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত এবং নিজের সামগ্রিক অধিকার পূর্ণ রূপে ভোগ করে কিন্তু যেসব দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য মুসলিম নাগরিক হিসাবে ইসলাম তার ওপর ন্যস্ত করে সেগুলো পালন করে না এমন ব্যক্তি সামগ্রিক নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভের অধিকার রাখে না। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই আইন লঙ্ঘনকারী ও বিদ্রোহী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে না। ইসলামী যাকাত ও সদকা মূলত সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন একক ব্যক্তি সম্পর্কিত নয়। এর পরিণাম ও ফলাফলের সম্পর্কও সমাজের সাথে কোন এক ব্যক্তির সাথে নয়। "

[সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত, (উর্দু অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪-১৫]

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী উক্ত ঘটনার সময় হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে খলীফাতুর রসূল! মানুষের সাথে নম্র ও মনস্তুষ্টির আচরণ করুন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, অজ্ঞতার যুগে তো তুমি বেশ বাহাদুর ছিলে এখন মুসলমান হয়ে এমন কাপুরুষতা দেখাচ্ছ!

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ফাযায়েলু ওয়া শামায়েল, হাদীস-৬০২৪, পৃ: ৪৯২)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যাহোক যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের আচরণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং এর কী ফলাফল আপন-পর সবার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেসম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করবে।

আজ আবারও আমি বিশ্বে চলমান পরিস্থি তি সম্পর্কে বলতে চাই, দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন উভয় পক্ষের সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দান করেন এবং মানুষ হত্যা থেকে এরা যেন বিরত হয়। এর পাশাপাশি এই যুদ্ধ থেকে আমাদের মুসলমানদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, এরা কীভাবে এক হয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানরা এক কলেমা পাঠ করা সত্বেও এক হয় না। নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে এক দেশ ধ্বংস করেছে, ইরাক ধ্বংস করিয়েছে, সিরিয়া ধ্বংস করিয়েছে, ইয়েমেনে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে আর এসব অন্যদের দ্বারা করায় আর নিজেরাও করছে। কমপক্ষে এই একতার শিক্ষাই তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা শিখে নিক।

আল্লাহ তা'লা মুসলিম জাতির প্রতি কৃপা করুন, উম্মতে মুসলেমার প্রতি কৃপা করুন আর এটি তখনই সম্ভব যখন এরা যুগ ইমামকে মানবে কেননা এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'লা তাকে এযুগে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন এরা যেন নিজেদের অবস্থা শুধরে নিতে পারে। সেইসাথে বিশ্ববাসীর জন্যও দোয়া করুন আর নিজে যুদ্ধে যুক্ত না হয়ে নিজের বিভিন্ন সামর্থ্য ও মাধ্যম ব্যবহার করে বিশ্বকে যুদ্ধ করতে বারণ করুন।

নামাযের পর আমি লাহোর নিবাসী জাফর ইকবাল হাশেমী সাহেবের সহধর্মিণী সৈয়্যদা কায়সার যাফর হাশেমী সাহেবার গায়েযবানা জানাযা পড়াব; যিনি সম্প্র তি ইন্তেকাল করেছেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলী বুখারী সাহেবের পৌত্রি ছিলেন। তিনি সৈয়্যদ নযীর আহমদ বুখারী সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ের পর বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর বিয়ে হয়। অতঃপর ১৯৮১ সালে আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। নামায, রোযায় নিয়মিত ছিলেন। তিনি দোয়াগো, সহানুভূতিশীলা, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞতাপরায়ণা, অত্যন্ত পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। মালি কুরবানির তাহরীকসমূহে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করতেন। বছরের শুরুতেই চাঁদা পরিশোধ করে দিতেন। আল্লাহ্ র ফযলে মরহুমা একজন মূসীয়া ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ছাড়া পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর এক পুত্র মাহমুদ ইকবাল হাশেমী আল্লাহ্র পথে কারাবন্দী হয়ে আছেন। বর্তমানে তিনি লাহোরের ক্যাম্প কারাগারে বা লাহোর জেলা কারাগারে রয়েছেন। কারাগার থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় নি কিন্তু প্রশাসন এতটুকু নম্রতা প্রদর্শন করেছে যে, মায়ের মরদেহ কারাগারে নিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে শেষদেখা করিয়ে দেয়। আহমদীদের বিরুদ্ধে ইসলামী আচার ও পরিভাষা ব্যবহারের অভিযোগে এত কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় যে, জানাযার নামায পড়ার জন্যও কারাগার থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয় না। অথচ, বড় বড় খুনিরাও কারাগার থেকে বের হওয়ার অনুমতি পেয়ে যায়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা এই দেশের সরকারের প্র তি করুণা করুন। মাহমুদ ইকবাল সাহেব এবং তাঁর তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের জুন মাসে মামলা দায়ের করা হয়। তাদের জামিনও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পুনরায় ২০২১ সালের আগস্ট মাসে তাদের জামিন নাকচ করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুনরায় আদালতেই গ্রেফতার করা হয। আল্লাহ্ তা'লা সত্তর এদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। মরহুমা'র এক পৌত্র হাশেম ইকবার হাশেমী সাহেব এখানে যুক্তরাজ্যে মুরুব্বী সিলসিলাহ হিসাবে কর্মরত আছেন। আল্ল াহ্ তা'লা তাকেও তার দাদীর পুণ্যকর্মের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং তার সন্তানদেরও আমল করার তৌফিক দান করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা মরহুমা'র প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করুন।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagwangola, (Murshidabad)

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৬ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে।

স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

প্রসঙ্গ রোযা

রোযা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তা'লার স্পষ্ট হুকুম অমান্য করে। খোদা তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফিরের সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এই আদেশ শিরোধার্য করা উচিত। কেননা নাজাত ফযলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তা'লা এটা বলেন নি যে, অসুস্থ ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট অথবা বড়, বরং হুকুম সাধারণভাবে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার উপর আদেশ ভঙ্গের ফতোয়া অবশ্যই লাগবে।

(বদর, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৭, ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ: ২৯০)

রোযা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

কেউ কেউ আছেন যারা ছোট ছোট বাচ্চাদের রোযা রাখান অথচ প্রত্যেক ফরয হুকুমের জন্য আলাদা আলাদা সীমা ও আলাদা সময় আছে। আমাদের দৃষ্টিতে কিচু বিধিনিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে বারো বছরের মধ্যে। আর কিছু এমন আছে যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। আমার নিকট রোযার হুকুম ১৫-১৮ বছরের বাচ্চার উপর। আর এটাই সাবালক হওয়ার সময় সীমা। ১৫ বছর থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে আর ১৮ বছর বয়সে রোযা ফরজ মনে করা উচিত। আমার স্মরণ আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরও রোযা রাখার শখ হতো,কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রোযা রাখতে দিতেন না। সুতরাং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য রোযা রাখা থেকে তাদের বাধা দেওয়া উচিত। তারপরে যখন সময় এসে যায়, যখন তারা নিজেদের শক্তিতে পৌঁছে যাবে যা ১৫ বছর বয়সে তখন তাদের রোযা রাখানো হোক। আর সেটাও খুব ধীরের সাথে। প্রথম বছর যতগুলো রাখবে পরের বছর তার থেকে বেশি আর তৃতীয় বছরে তার থেকে বেশি, এইভাবে পর্যায়ক্রমে রোযা রাখার অভ্যাস বানানো হোক।

(আল ফযল, ১১ এপ্রিল, ১৯২৫, ফিকাহ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেন:

বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনের ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে তার জন্যও রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সে পাপের ভাগীদার হবে।

(আল ফযল, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, ফিকাহ আহমদীয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণের শেষাংশ, পূর্বের সংখ্যার পর)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে- 'জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।' এর অর্থ, মহিলা তার সন্তানের জন্য জান্নাতের পথ। তথাপি এই হাদীসে এক মহান বার্তা রয়েছে যা প্রত্যেক আহমদী মহিলার মনে গেঁথে নেওয়া উচিত। সেই বার্তাটি হল- আহমদী মেয়েদের নিজের সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা এমনভাবে করা উচিত যে, তারা যেন পুণ্যবান হয় আর খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন হয়। অর্থাৎ তাদের তরবীয়তের কল্যাণে কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী হয় আর রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের তরবীয়তের কল্যাণে তারা যেন যুগ ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহর সকল উপদেশাবলী শিরোধার্যকারী হয়। এবং তাদের তরবীয়তে সন্তানেরা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকারী হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে, যাদের প্রতি তিনি প্রীত হন। অতঃপর জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আমি ইসলামে নারীর মর্যাদার যেদিকগুলির উল্লেখ করেছি, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন আহমদী মুসলমান মহিলা কত উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সেই মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং অনুধাবন করা প্রত্যেক আহমদী মহিলার কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের মেয়েদের আধুনিক ফ্যাশনের অবলম্বন করা উচিত নয় আর এই ফ্যাশনের বাহ্যিক পরিপাটি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন এবং খোদা তা'লার নৈকট্যের সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে সেই উচ্চ মর্যাদা লাভের চেষ্টা করা উচিত যার দ্বারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টিভাজন হতে পারে। যদি তারা এটি অর্জন করে নেয়, তাহলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবে, যার কল্যাণে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম সুরক্ষিত হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব, সংক্ষেপে আমি আপনাদের সকলকে নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা এবং দায়িত্বাবলী অনুধাবন করার বিষয়ে জোর দিচ্ছি। আপনাদের সকলের জীবনে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন করা উচিত। আর সংসার সামলানোর পাশাপাশি বন্ধুববান্ধবদের মাঝে তবলীগ করার দ্বিগুণ দায়িত্ব পুরো করা উচিত, যাতে আপনারা ইসলামের বাণী প্রচারে নিজেদের মহান ভূমিকা পালনকারী হন। আপনাদের সকলের খিলাফতের সাহায্যকারী হওয়া উচিত, যার ফলে আমাদের জামাতের উন্নতিতে বিপুল বৃদ্ধি ঘটবে।আমি আশা করি, নিউজিল্যাণ্ডের ন্যায় সুদূর প্রান্তের দেশে থেকেও আপনারা এক নতুন আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ পৃথিবী ভয়াবহ অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং পাপাচারের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমি আশা করি, আপনারা সকলে মিলে পৃথিবীকে মহাবিনাশের এই বিপদজনক পথ থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে খিলাফতে আহমদীয়ার সত্যিকার 'সুলতানে নাসীর' (সাহায্যকারী) হওয়ার তৌফিক দিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সব শেষে আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আমাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করে এম.টি.এ এবং জামাতের ওয়েবসাইট হিসেবে এক নেয়ামত দান করেছেন। আপনাদের সকলের উচিত আমার অনুষ্ঠানগুলি খো যাতে আপনারা সেগুলি থেকে সব সময় দিক-নির্দেশনা লাভ করতে থাকেন আর আপনারা জানতে পারেন যে, যুগ খলীফা আপনাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখেন। অনুষ্ঠান দেখার পর যুগ খলীফার নির্দেশাবলী ও উপদেশাবলী মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। যুগ খলীফার কাছ থেকে যতটুকু শেখেন তা ধারণকারী হন এবং এমন সব কর্মসূচি তৈরী করুন যা আপনাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়। এভাবে জামাতের ঐক্য ও সংহতির সৌন্দর্য ও বিশেষত্বটি চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবে। প্রত্যেক আহমদী যেন যুগ খলীফার নির্দেশাবলী অপরের কাছে পৌঁছে দিবে আর এর ফলে আপনাদের প্রত্যেকটি কাজ আশিসমণ্ডিত হবে আর খিলাফতের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ আমি যে কথাগুলি আপনাদের সামনে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সেগুলি মেনে চলার তৌফিক দান করুন আর আপনারা যেন ভালভাবে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালনকারী হন। আল্লাহ্ আপনাদের সকল প্রচেষ্টায় বরকত দিন। এবং নিউজিল্যাণ্ড জামাতের লাজনা ও নাসেরাতদের মহান সফলতায় ভূষিত করেন। আমীন।

জলসা সালানা নিউজিল্যাণ্ডে হুযুর আানোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ।

তাশাহুদ, তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ জামাত আহমদীয়া নিউজিল্যাণ্ডের জলসা সালানা সমাপন হতে চলেছে। আমার বাসনা এবং প্রত্যাশা হল এই যে, জলসার এই তিন দিন জামাতের সদস্যরা জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং খোদা তা'লার নৈকট্যে উন্নতি লাভ এবং তাঁর সঙ্গে আরও দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করে থাকবে। আমি দোয়া করি, আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা অমূলক নয়। আর নিউজিল্যাণ্ড জামাতের প্রত্যেক সদস্য আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। যাইহোক আজ আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই যা প্রত্যেক আহমদীর সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একজন আহমদী যেহেতু যুগ ইমামের হাতে বয়আতকারী, তাই সে তখনই সত্যিকার আহমদী হিসেবে গণ্য হবে যখন সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত প্রত্যাশায় উত্তীর্ণ হবে। তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের কাছে প্রত্যাশা রেখেছেন যে তারা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অনুসারে নিজেদের মধ্যে প্রকৃত ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করবে। এই চেষ্টা যদি না থাকে, তবে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করা কোনও মূল্য রাখে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার বলেছেন, যদি আহমদী আর অ-আহমদীদের মাঝে কোনও পার্থক্য না থাকে, তবে মসীহ মওউদ এর উপর ঈমান আনা কোনও কাজে আসবে না। অবশ্যই মানদণ্ডের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত। আর আহমদীরা খোদা তা'লার ইবাদতে অগ্রণী হবে এবং কুরআন করীমের প্রতিটি আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক আহমদীর উচিত ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা এবং বিচার করা যে, তার এবং অন্যদের মাঝে সত্যিই কি কোনও পার্থক্য রয়েছে? এই বিশ্লেষণ করা উচিত কুরআন করীম, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এর ন্যায় নেয়ামত দ্বারা আমাদের জনন্য জীবন অনেক সহজ করে দিয়েছেন। সারা দিন এম.টি.এ-তে এমন সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় যা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে আর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উচ্চমানের দিকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে alislam.org এর উপর একটি ক্লিকেই হাজার হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে। তাই প্রথম যে কথাটি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই তা হল আপনারা এম.টি.এর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করুন। অন্তত পক্ষে আমার খুতবা, ভাষণ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। আমি একথাও বলতে চাই যে, কেবল অনুষ্ঠান দেখাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সব অনুষ্ঠানগুলিকে অনুসরণ করুন এবং সেখান থেকে যা কিছু শিখতে পারেন, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন, আপনাদের তাকাওয়া ও পুণ্যের মান যেন উচ্চ হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা একজন সত্যিকার মুসলমানের কাছে কি চান? খোদা তা'লা একজন সত্যিকার মোমেনকে কি আদেশ করেছেন? খোদা তা'লা একজন সত্যিকার মুসলমানে উপনীত দেখতে চান? বিশেষ করে সেই সব লোকদের মান কি হওয়া উচিত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যুগের ইমাম হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার এবং সত্য মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔

অর্থ:তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কতক মো'মেন এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।"

অতএব, একজন সত্যিকার মুসলিম জামাতের এটিই লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করা

যদি আপনার প্রতিবাদ প্রশাসনিক কর্তাদের কানে পৌঁছতে পারে, তবে তাদের কানে সে কথা তুলুন আর তাদেরকে বলুন যে, অন্যায় কখনও উন্নতি করে না।

দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা, ভাঙচুর করা একজন মোমেনের জন্য শোভনীয় নয় আর এর অনুমতিও নেই। যাইহোক এর জন্য প্রজ্ঞা ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক তৈরী করুন। যদি ফিলিস্তীনবাসীরা সঠিক অর্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দোয়া করে এবং নিজেদের স্বভাব-চরিত্র এবং ঈমানকে সেই মানে উপনীত করতে পারে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শোনেন আর মোমেনদের সাহায্য করেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

ইনশাআল্লাহ্ এমন একদিন আসবে যেদিন উম্মতে মুসলেমা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে খানা কাবায় প্রবেশ করবে।

আগামী দশ বা কুড়ি-বছর জামাতের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।এই বছরে আমরা দেখব, ইনশাআল্লাহ্ অধিকাংশ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় নিবে। কিম্বা বলা যেতে পারে মুসলমানদের মধ্য থেকেও অধিকাংশই এই সত্য স্বীকার করে নিবে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে হাইফা (কাবাবির)-এর আহমদী সদস্যদের অনলাইন সাক্ষাত

৫ই জুন, ২০২১ তারিখে হাইফা (কাবাবির)-এর জামাতের পুরুষরা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হুযুর আনোয়ার টিলফোর্ড স্থিত অফিস থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ফিলিস্তানী সদস্যরা ১৯৩১ সনে নির্মিত ঐতিহাসিক মসজিদ 'মসজিদ মাহমুদ' থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান অনুযায়ী কয়েকটি প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর কাবাবিরের স্থানীয় আহমদী মুসলমানেরা হুযুর আনোয়াকে প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন নিবেনদন করেন যে, কাবাবীরে জামাত আহমদীয়ার শতবার্ষিক জুবিলি ২০২৮ সালে উদযাপিত হবে। তিনি হুযুর আনোয়ারের নিকট দিক নির্দেশনা চান যে, কিভাবে এই ঐতিহাসিক মাইল ফলক এবং স্মারকটিকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় উদযাপন করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কথা হল, কোনও একটি বিশেষ দিনের আগমণে বা কোনও একটি সময় পূর্ণ হওয়াতে লক্ষ্য অর্জিত হয় যায় না। আসল বিষয় হল, একশ বছর পূর্ণ করার জন্য আপনরা কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন? আপনাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত ইসলাম অবলম্বন করেছেন? আপনাদের মধ্যে কতজন সঠিক অর্থে ইবাদুর রহমান হতে পেরেছেন? আপনাদের মধ্যে কতজন ইবাদতের উচ্চ মান বজায় রেখেছেন আর যারা ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল নামাযও পড়েন? আপনাদের মধ্যে কতজন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে নিজেদের পরিবারে, গোত্রে এবং নিজেদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে পৌঁছে দিতে আগ্রহী, বরং এর জন্য চেষ্টাও করেন? আপনাদের মধ্যে কতজন এমন আছেন যাদের মৌলিক চরিত্র থেকে উন্নততর হয়েছে? আপনাদের মধ্যে কতজন এমন আছেন, যাদের পরিবারে শান্তি, ভালবাসা ও সৌহার্দের পরিবেশ বজায় আছে? আপনাদের মধ্যে কতজন এমন আছেন যারা নিজেদের সন্তানদেরকে আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেছেন? আপনাদের শিশুরা যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসারে বড় হয়, সে বিষয়ের উপর কতজন দৃষ্টি রাখেন? আপনাদের মধ্যে কতজন শিশুদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাদানের যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন? আপনাদের মধ্যে কতজন এমন আছেন যারা নিজেদের চারপাশের পরিবেশে এই প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে তারা হলেন সেই সব মুসলমান যারা ইসলামের প্রকৃত নমুনা? সুতরাং এই বিষয়গুলি এবং আরও কতক অন্যান্য বিষয়গুলি যদি আপনাদের মধ্যে থাকে, আর উক্ত কাজগুলি আপনারা করে থাকেন এবং করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে শতবছর জুবিলিতে প্রবেশ করছেন, তবে মনে করবেন যে, আপনারা শতবার্ষিকি জুবিলি ভালভাবে উদযাপন করার চেষ্টা করছেন। আর যদি না তা হয়, তবে এই সাত বছরে চেষ্টা করুন সেই সব বিষয়গুলি অর্জন করার এবং এর পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা অর্জন করার। সেই সঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপনাদের মধ্যে কতজন এমন আছেন যারা খিলাফতের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে সম্পর্ক রাখে এবং নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে। অতএব, এই কাজগুলি যদি আপনারা করে নেন আর যদি না করে থাকেন তবে এর জন্য চেষ্টা করবেন, তখন বুঝনে যে আপনারা শতবার্ষিকি জুবিলি সত্যিকার অর্থে উদযাপন করছেন। আর এই সাত বছরে প্রকৃত অর্থেই সেগুলি অর্জন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হাইফাবাসী এক ফিলিস্তানী প্রশ্ন করেন যে, হাইফায় থেকে কিভাবে ফিলিস্তিনের সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন মুসলমানের জন্য আদেশ হল সে যে স্থানে বসবাস করছে সেখানকার দেশীয় আইন মেনে চলবে। সরকার যদি অত্যাচার করে তবে অত্যাচারের স্থান সে ত্যাগ করুক, হিজরত করে অন্যত্র চলে যাক। কিন্তু এখানে থেকেও যদি আপনার প্রতিবাদ প্রশাসনিক কর্তাদের কানে পৌঁছতে পারে, তবে তাদের কানে সে কথা তুলুন আর তাদেরকে বলুন যে, অন্যায় কখনও উন্নতি করে না। আর সর্বত্র সরকারকে জানিয়ে রাখা এবং প্রত্যেক অত্যাচারীকে একথা বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ যে, অন্যায় কখনও উন্নতি করে না আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব। এর জন্য অনেক সময় কঠোরতার সম্মুখীনও হতে হয়।যেমন পাকিস্তানে একটি আইন রয়েছে, যার দ্বারা আহমদীদেরকে অ-মুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানকার আইনের প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমরা আহমদীরা নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে মেনে নিতে হবে, আর আহমদীরা একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আইন বলছে তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ উচ্চারণ করতে পারবে না। কোন আহমদী একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। আইন বলছে, তোমরা নামায পড়তে পারবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবে না, কিবলামুখি হতে পারবে না। কোনও আহমদী একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অনুরূপভাবে আরও অনেক ইসলামী বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য যে সব আইন রয়েছে, আহমদীরা সেগুলি পুরোপুরি মেনে চলে। প্রথমত, এমন কঠোর পরিস্থিতি হয় আর হিজরত করার সামর্থ থাকে, তবে ইসলামের আদেশ হল, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে অত্যাচারী দেশ থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও কিম্বা যদি সেখানে থাকতে হয় তবে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে নিজের দাবি জানিয়ে দাও। আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনে এই নমুনা এবং আদর্শই আমরা দেখতে পাই। ভাঙচুর করা, দেশ ও জাতির সম্পদ নষ্ট করা, মানুষের ক্ষতি করা আহমদীদের কাজ নয়। আর সব সময় এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, আমরা সর্বত্র সত্যের জন্য সরব হব। আর সত্যের জন্য সোচ্চার হতে গেলে অনেক সময় অত্যাচার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasid, Basantapur, 24 Pgs (S)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Aseya Begum, Harhari, (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 14 April, 2022 Issue No. 15

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সহ্য করতে হয়। তাছাড়া যখন ফিলিস্তিন বা ইজরাইলের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, সেই সময় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব জাতিসংঘে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় জাতিকে সমান অধিকার না দেওয়া হয়, এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফিলিস্তীনি ও ইজরাইলবাসীদের যদি থাকতে হয়, তবে তারা দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকুক। বলতে গেলে আপনি ফিলিস্তিনের মানুষ, ফিলিস্তিনে পৃথক সরকার রয়েছে, কিন্তু সেটিও তো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। এদেশকে পৃথিবীর কোনও দেশ স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এমনকি জাতিসংঘও না। তাই ফিলিস্তীনে থেকেও কমবেশি আপনারা চাপের মধ্যেই থাকেন। তাই যদি বলেন যে, ইজরাইলে থেকে কিভাবে আইন মেনে চলবেন- ফিলিস্তিনে থেকেও তো আপনাদেরকে কঠোরতা সহ্য করতে হয়। তাই এটাই করতে হবে যে, সরকারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদ জানাতে হবে আর চাপের মধ্যে থাকা ফিলিস্তিনী সরকারের পরিবর্তে, যাদের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই, এমন লোকদের একত্রিত হতে হবে যারা এই দাবিকে এমন আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিবে, যার ফলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যাইহোক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মোমেনের একটি প্রাথমিক কর্তব্য। অন্যথায় অন্যায় সংঘটিত হওয়া সেই দেশ থেকে হিজরত করে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এই দুটি বিকল্পই রয়েছে, এগুলি ছাড়া দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা, ভাঙচুর করা একজন মোমেনের জন্য শোভনীয় নয় আর এর অনুমতিও নেই। যাইহোক এর জন্য প্রজ্ঞা ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক তৈরী করুন। যদি ফিলিস্তীনবাসীরা সঠিক অর্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দোয়া করে এবং নিজেদের স্বভাব-চরিত্র এবং ঈমানকে সেই মানে উপনীত করতে পারে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শোনেন আর মোমেনদের সাহায্য করেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

এক ভদ্রলোক সূরা ফাতাহ-র ২৮ নং আয়াত সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, এই আয়াতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সপক্ষে কবে পূর্ণ হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ আমার সোপর্দ করেছেন আর আমার যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে কথাগুলি আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন আর আমি যেগুলি জামাতকে জানিয়েছি সেগুলি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই পূর্ণ হবে। সেগুলি কবে পূর্ণ হবে তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। কালকেই আমি খুতবায় হযরত উমরের ঘটনা বর্ণনা করেছি, যখন এই আয়াত নাযেল হয়, তখন আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, আমার স্বপ্ন সত্য, আমরা হজ্জ করব, খানা কাবা তোয়াফ করব। কিন্তু আমি একথা বলি নি যে, এবছরই করব। সেখানে আঁ হযরত (সা.) আগামী বছরের কথাও নির্দিষ্ট করে বলেন নি। কিন্তু শত্রুদের পক্ষ থেকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল যে, অচিরেই একজন বিজয়ীর বেশে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা যখন আঁ হযরত (সা.) কে বলেছিলেন আর আঁ হযরত (সা.)ও সেই নির্দিষ্ট করে বলেন নি, সেখানে আমি আপনাদেরকে কিভাবে নির্দিষ্ট করে বলতে পারি? বুঝতে পেরেছেন? তবে একথা নিশ্চিত যে, ইনশাআল্লাহ্ এই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন পূর্ণ হবে। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী আর আল্লাহ্র কথা আর আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী ও ইলহাম পূর্ণ হতে দেখেছি। আর যে সব কথা তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করেছিলেন, সেগুলিও পূর্ণ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এমন একদিন আসবে যেদিন উম্মতে মুসলেমা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে খানা কাবায় প্রবেশ করবে।

উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে আরও এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার আগামী দশ বছরে জামাতে আহমদীয়া মুসলেমার উন্নতি কিভাবে দেখছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের উন্নতি তো অবশ্যই হচ্ছে। অদৃশ্যের সংবাদ আমি জানি না। মানুষ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের যে উন্নতি হচ্ছে আর যেভাবে প্রসার লাভ করছে, প্রতিটি দেশে, প্রতিটি দেশের একাধিক শহরে যেভাবে জামাতের ভিত রচিত হয়েছে, জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, পৃথিবীর প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলিতেও জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, জামাতকে পূর্বের থেকে বেশি জানতে শুরু করেছে, এর থেকে আমরা আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী দশ বা কুড়ি-বছর জামাতের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।এই বছরে আমরা দেখব, ইনশাআল্লাহ্ অধিকাংশ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় নিবে। কিম্বা বলা যেতে পারে মুসলমানদের মধ্য থেকেও অধিকাংশই এই সত্য স্বীকার করে নিবে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম।

আরও এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারকে এমন লোকদের সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চান যারা ভাল কাজ করার সদিচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির অভাবে তা করে উঠতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সদিচ্ছা থাকাটাই যথেষ্ট নয়। ইচ্ছার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা সেই সময় লাভ হয়, যখন কোনও ব্যক্তি সে বিষয়ে ব্যবহারিক পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্তরে কোনও কিছু চিন্তার উদ্রেক হওয়া বা সংকল্প করা সংশয়বাদী ও হতাশাগ্রস্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য। কারো যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, তবে সে সেই কাজ করার জন্য পদক্ষেপও গ্রহণ করে। আঁহযরত (সা.) বলেছেন, কর্ম নির্ভর করে উদ্দেশ্য বা সংকল্পের উপর। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এই নয় যে, কেবল সদিচ্ছার কারণেই প্রতিদান পাবে। প্রত্যেকের উচিত শুধু সংকল্প দিয়ে নয়, বরং নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতাকেও কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করার পর পরিণাম আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দেওয়া।

****

রোযার অবস্থায় Corona Vaccine নেওয়ার বিষয়ে নির্দেশিকা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

'রোযা থাকা অবস্থায় যাবতীয় প্রকারের ইনজেক্শন নেওয়া নিষিদ্ধ, সেটি Intramuscular হোক বা Intravenous হোক। যদি কোন আহমদী কোরোনা ভ্যাকসিনের জন্য রমযানের মাসে এপয়েন্টমেন্ট পায় তবে ইসলাম যে অব্যহতি দান করেছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার দিন সে যেন রোযা না রাখে, আর রমযানের পর সেই রোযা পূর্ণ করে। "

(আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৬ই এপ্রিল, ২০২১)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir